প্রথম আলো

মতামত

‘শিক্ষিকা’ একটি সম্বোধন নাকি সীমারেখা

লেখা: রেজওয়ানা করিম

প্রকাশ: ২৯ মার্চ ২০২৬, ১০: ৪২

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসমা সাদিয়াকে হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ *ফাইল ছবি*

গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে ২০২৪-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনপরিসরে একটি লক্ষণীয় প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: কোনো ব্যক্তির সম্পূর্ণ বক্তব্য না বুঝে তাঁর কথার খণ্ডাংশকে বিচ্ছিন্ন করে সেটিকেই ‘পূর্ণ সত্য’ হিসেবে প্রচার করা। পরিপ্রেক্ষিতকে সরিয়ে দিয়ে অর্থ নির্মাণ করা এবং সেই নির্মিত অর্থকেই সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা—এসবই ভাষার রাজনীতির অন্তর্গত।

এ প্রক্রিয়ায় ভাষা কেবল তথ্য বহন করে না; বরং এটি বাস্তবতাকে নির্মাণ করে এবং সেই নির্মাণের মধ্য দিয়েই ক্ষমতার সম্পর্ককে দৃশ্যমান ও কার্যকর করে তোলে। এই ভাষা-রাজনীতি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, যখন আলোচনার কেন্দ্রে থাকে একজন নারী, বিশেষত যদি তিনি হন একজন শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়-সংযুক্ত, দৃশ্যমান এবং মতামত প্রকাশে সক্রিয়; তখন তাঁকে 'শিক্ষক' বলা হয় না, বলা হয় 'শিক্ষিকা'। এ পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে ব্যাকরণগত মনে হলেও বাস্তবে এটি একটি সামাজিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজনকে 'স্বাভাবিক' এবং অন্যজনকে 'চিহ্নিত' করে তোলা হয়। এই চিহ্নায়নের মধ্য দিয়েই একটি অদৃশ্য সীমারেখা টানা হয়।

জ্ঞান কি লিঙ্গ চেনে? 'গুরু' থেকে 'শিক্ষিকা'—একটি ভাষাগত বিচ্যুতি

এ প্রশ্ন আরও গভীর হয়, যখন আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষা ও জ্ঞান-ঐতিহ্যের দিকে তাকাই। উপমহাদেশীয় জ্ঞান-সংস্কৃতিতে 'গুরু' একটি মৌলিক ধারণা, যা কখনোই লিঙ্গভিত্তিকভাবে বিভক্ত হয়নি। 'গুরু' বলতে জ্ঞানদাতা, পথপ্রদর্শক—এ পরিচয়ই প্রাধান্য পেয়েছে; সেখানে 'নারী গুরু' বা 'পুরুষ গুরু'র আলাদা কোনো ভাষাগত প্রয়োজন তৈরি হয়নি।

অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত পরিচয় ঐতিহাসিকভাবে লিঙ্গনিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক ভাষায় এসে আমরা সেই ঐতিহ্য থেকে সরে এসে পেশাকে লিঙ্গচিহ্নিত করতে শুরু করেছি, যেখানে 'শিক্ষক' আর 'শিক্ষিকা' আলাদা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রশ্নটি কেবল ভাষাগত নয়; এটি একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রশ্নও—আমরা কি আমাদের ঐতিহাসিক লিঙ্গনিরপেক্ষ জ্ঞানধারাকে ধরে রাখতে পারছি, নাকি নতুন করে একটি বিভাজন তৈরি করছি?

মিডিয়ার ভাষা: সম্বোধনের ভেতরে নির্মিত পার্থক্য

এ বাস্তবতা কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সামাজিকভাবে পুনরুৎপাদিত হয়, বিশেষত সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে। সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে প্রকাশিত একাধিক শিরোনামে আমরা দেখি—'ইবি শিক্ষিকাকে গলা কেটে হত্যা', 'ছুরিকাঘাতে আহত ইবি শিক্ষিকা মারা গেছেন', 'ইবি শিক্ষিকা হত্যা'। একই ঘটনার বর্ণনায় ধারাবাহিকভাবে লিঙ্গচিহ্নিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও 'নারী শিক্ষক' বলা হয়েছে, কিন্তু 'শিক্ষক' শব্দটি প্রায় অনুপস্থিত। এ ভাষা কেবল ঘটনা বর্ণনা করে না; এটি একটি সামাজিক বিন্যাস তৈরি করে, যেখানে 'শিক্ষক' অদৃশ্য মানদণ্ড এবং 'শিক্ষিকা' একটি চিহ্নিত ব্যতিক্রম। ফলে ভাষা এখানে নিরপেক্ষ থাকে না; এটি সক্রিয়ভাবে পার্থক্য তৈরি ও পুনরুৎপাদন করে।

ভাষা, লিঙ্গ ও ক্ষমতা

ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে ব্যাখ্যা করে। ফেমিনিস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ রিফর্ম মুভমেন্ট দেখিয়েছে যে ভাষা কেবল বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, এটি সেই বাস্তবতাকে নির্মাণ করে। ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী ডেবোরাহ ক্যামেরন ভাষাকে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ান নারীবাদী

ডেল স্পেন্ডার যুক্তি দেন, ভাষা ঐতিহাসিকভাবে পুরুষকেন্দ্রিক কাঠামোর মধ্যে নির্মিত। মার্কিন দার্শনিক ও জেন্ডার তাত্ত্বিক জুডিথ বাটলার দেখান, ভাষার পুনরাবৃত্ত ব্যবহারই সামাজিক বাস্তবতাকে স্থায়ী করে। এই তাত্ত্বিক অবস্থানগুলো নীতিগত পর্যায়েও প্রতিফলিত হয়েছে—জাতিসংঘের জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাষা ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া তারই প্রমাণ।

বাংলাদেশে প্রমিত ভাষা: প্রতিষ্ঠান, নীতি ও লিঙ্গচিহ্নায়ন

এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভাষাচর্চা একটি স্পষ্ট নীতিগত দ্বৈততার মুখোমুখি। বিশেষত বাংলা একাডেমির অভিধান ও প্রমিত ভাষার কাঠামোতে 'শিক্ষক/শিক্ষিকা', 'অধ্যাপক/অধ্যাপিকা'র মতো দ্বৈত রূপকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা ভাষার মধ্যেই লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। ফলে এই চিহ্নায়ন কেবল সামাজিক নয়, এটি শিক্ষা, প্রশাসন ও নীতিনির্ধারণী কাঠামোর মধ্য দিয়েও পুনরুৎপাদিত হয়। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী পিয়ের বুর্দিউর ভাষায়, এটি প্রতীকী ক্ষমতার একটি উদাহরণ, যেখানে ভাষা সামাজিক বাস্তবতাকে বৈধতা দেয় এবং প্রতীকী সহিংসতার মাধ্যমে সেই বাস্তবতাকে স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠা করে।

রাজনীতি ও সম্বোধন: অসম্পূর্ণ এক ভাষা-সংস্কার

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাষাচর্চাও এই দ্বৈততা থেকে মুক্ত নয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপির চেয়ারপারসন হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার আত্মপ্রকাশে একসময় 'চেয়ারপারসন'-এর মতো একটি লিঙ্গনিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষাগত পরিবর্তনের একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, যা দেখিয়েছিল—রাজনীতি চাইলে ভাষাকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে পারে। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা টেকেনি। ফলে প্রশ্নটি আরও গভীর হয়: যখন লিঙ্গনিরপেক্ষ ভাষার একটি রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, তখন সেটিকে কেন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিস্তৃত করা হলো না? এ প্রশ্ন কেবল ভাষার নয়, এটি রাজনৈতিক ইচ্ছা ও নীতিগত অগ্রাধিকারের প্রশ্ন।

শেষ প্রশ্ন: সম্বোধন কি সীমারেখা তৈরি করে?

অতএব, এ আলোচনার উদ্দেশ্য কোনো শব্দ নিষিদ্ধ করা নয়; বরং একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আনা—আমরা ভাষার মাধ্যমে মানুষকে কীভাবে চিহ্নিত করছি এবং সেই চিহ্নিতকরণ কতটা প্রয়োজনীয় বা ন্যায়সংগত। ভাষা আমাদের চিন্তার কাঠামো নির্মাণ করে আর নীতি সেই ভাষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। ফলে ভাষা ও নীতি—দুটো মিলেই সামাজিক বাস্তবতা গড়ে ওঠে। যে সম্বোধন মানুষকে আলাদা করে চিহ্নিত করে, সেটিই ধীরে ধীরে একটি অদৃশ্য সীমারেখায় পরিণত হয়। তাই প্রশ্নটা এখন একেবারেই মৌলিক—আমরা কি মানুষকে তার জ্ঞান দিয়ে চিনব, নাকি তার সম্বোধনের ভেতরেই তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখব?

ড. রেজওয়ানা করিম

সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

*মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো